বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার, জনপ্রিয়করণ ও প্রচার: ভবিষ্যতের পথ

মিলন গাইন

মিলন গাইন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ও ভৌতবিজ্ঞানে এমন ফিল। তিনি উত্তর রবীন্দ্রনগর বিবেকানন্দ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তিনি রাজ্য বিজ্ঞান শিক্ষা উপসমিতির আহ্বায়ক। তাঁর আগ্রহের বিষয় লেখালিখি, দূরবীণে আকাশ চেনানো, ও কম খরচে বিজ্ঞানের মডেল তৈরি তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিজ্ঞানের ক্লাস নেওয়া। তাঁর রচিত পুস্তক সংখ্যা সাত ও পুস্তিকা চারটি।

সংক্ষিপ্তসার

প্রাককথন: স্বাধীনতার ৭৩ তম বর্ষে আমাদের ভাবতে হচ্ছে নিজমাতৃভাষায় বিজ্ঞান ভাবনা, বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমুহ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী মানুষেরকাছে কতটুকু পৌঁছেছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রযুক্তি ব্যবহারে জনপ্রিয়তা বেড়েছে কিনা-বিজ্ঞানের যে সুফল তা মাতৃভাষায় প্রচারে এসেছে কিনা! এসব প্রশ্ন এজন্যই, ১৯০ বছরের বৈদেশিক শাসনে আমাদের স্বদেশ, স্বদেশের মানুষের বৃহৎ অংশ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদীক্ষার সুযোগই পাননি। সমীক্ষায় ফলাফল বলেছে গত শতাব্দীর ৬ঐর দশকে ৬০ ভাগ মানুষ আমাদের দেশে নিরক্ষর ছিলেন। তাঁদের কাছে বিজ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা এসবই অর্থহীন অভিভাষন বলা যেতে পারে।

আলোচনার মূল পর্বে প্রবেশের আগে আমরা সবাই একমত হবো যে প্রাচীন দর্শনগত দিক থেকে ছিল ভাববাদী (idealistic), কপাল-ভগ্য-নিয়তি নির্ভর। তা থেকে বেরিয়ে আসতে অতীতে পাহাড়প্রমাণ প্রতিকূলতা ছিল কিন্তু প্রতিবাদী চেষ্টা ছিল চার্বাকদের কর্মকান্ডে।

(১) দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর বেশ ক'জন প্রকৃত দেশপ্রেমিক সংস্কারমুক্ত মানুষ, যেমন বিজ্ঞান লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭), এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় - এঁরা প্রত্যেকে স্ব স্ব মেধার উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান থেকে বিজ্ঞান বিষয়কে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্প্রসারিত করতে নিজ নিজ ক্ষুরধার লেখনি কে যেমন ব্যবহার করেছেন তেমনি প্রশাসনিক-রাজনৈতিক প্রতিকূলতা কে উপেক্ষা করে স্বদেশের বুকে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আশুতোষ মুখার্জীর মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হবার সুবাদে স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা মূলক মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জনে অনেকটাই গতি আনতে পেরেছিলেন। অবশ্য এই বেপরোয়া মনোভাব এসেছিল রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৭০), ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), গণিতজ্ঞ রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-১৮৭০) এবং গোঁয়ার 'এঁড়েবাছুর' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় স্বদেশপ্রেম থেকে। এঁরা প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন হাজার হাজার বছরের অন্ধ সংস্কার আর অবৈজ্ঞানিক প্রচলিত সামাজিক প্রথা পালন থেকে ভারতীয় জনসমাজ ইউরোপের রেনেসাঁস উদ্ভুত বিজ্ঞান সংস্কৃতিতে আলোকিত হোক। শাস্ত্রীয় অন্ধ বিশ্বাস প্রবনতা থেকে যুক্তিবাদে আস্থা রেখে 'নিয়তির লিখন' থেকে স্পর্ধা দেখিয়ে বেড়িয়ে আসুক।

আমরা লক্ষ্য করি জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় এর মতো শিক্ষকের সাহচর্যে মেঘনাদ সাহা (১৮৯১-১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৯৪-১৯৭৪), ড: মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা (১৯০০-১৯৭৭) মাতৃভাষা বাংলাতে বিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয় শ্রেণীকক্ষে সাবলীল ভাবে উপস্থাপন করছেন, পত্রপত্রিকায় লিখছেন, গবেষণার বিষয় মাতৃভাষায় লিখছেন যা নব্যভারত, মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী, বাংলা একাডেমি (ঢাকা) সহ আরো পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

(২) মুদ্রন ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রসার প্রসঙ্গ: নব্য ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত বিশেষত করা বিভাগে রাজনীতি-অর্থনীতি-আইনি ব্যারিস্টারি ওকালতি, এদিকেই মেধাবী গুটিকয়েক 'বাঙ্গালী ভারতীয় ইংরেজ' হয়ে তাঁরা ভাবতেন বাংলাভাষা কোনো কার্যকরী ভাষা নয়। ইংরেজি ভাষায় তোতাপাখির মতো বিজ্ঞানের কিছু মুখস্থ করে বিতরণ করলেন কম ইংরেজি জানা বা আদৌ না

জানা শিক্ষার্থীর কাছে মান্যতা বাড়াতো। বাংলাভাষায় বলতে বা লিখতে বসলে 'ঠিক্ ঠিক্ বাংলাতে আসেনা' গোছের কথা বলে নিজের বিদ্যে বুদ্ধি আস্তিনে গুটিয়ে নিতেন। এঁরা হলেন ষব্য ইংরেজি জানা স্বদেশী ইংরেজ।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করে এই দূর্দশার থেকে নব্য বাঙালি ইংরেজি শেখা দেশীয় মান্যবরদের চোখ খোলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞানের নব্য আবিষ্কারকে বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের কাছে 'সেদ্ধচাল' থেকে 'পান্তাভাতে' পরিনত করলেন। জগদীশচন্দ্র বসু, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য রা নব উদ্যমে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ মাতৃভাষা বাংলায় লিখে প্রকাশ করে বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসার মাত্রা বাড়তে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্নাতক স্নাতকোত্তর স্তরে রসায়নের জটিল বিষয় সাবলীল বাংলাতে আদরের সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কদাচিৎ বিজ্ঞানের বিষয় আলোচিত হতো। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়ে প্রথাগত বিজ্ঞান চর্চা না করে নিজ অধ্যাবসায়ে 'বিশ্বপরিচয়' লিখে প্রকাশ করে বাংলা ভাষাভাষী বিজ্ঞান পিপাসুদের অভিভূত করে গেছেন। এ কী করে সম্ভব?!

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে গেলে হাতেকলমে পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর গুরুত্ব বাড়াতে হবে। অভিজ্ঞতা এই, খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে একজোড়া আতসকাঁচ আছে। একজোড়া দন্ডচুম্বক, একটা কাঁটাকম্পাস, তাও নেই। তারা বিজ্ঞান শেখে বইতে আঁকা ছবি দেখে দেখে। শ্রেনীকক্ষে পড়ানোর পদ্ধতিতে পরিবর্তন দরকার।

এখন পেনড্রাইভ, সিডি, মোবাইলে মেসেজ পাঠানো, হোয়াটস আপের ব্যবহারে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে যা বিজ্ঞান প্রসারের ইতিবাচক উদাহরণ। পাশাপাশি দূরদর্শনের ভূমিকা সহ গ্রামে গ্রামে ডীপ টিউবওয়েল থেকে পরিস্রুত পানীয় জল প্রাপ্তি, চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি–সমাজের সার্বিক উন্নয়নে বিজ্ঞানের ব্যহার বাড়ছে।